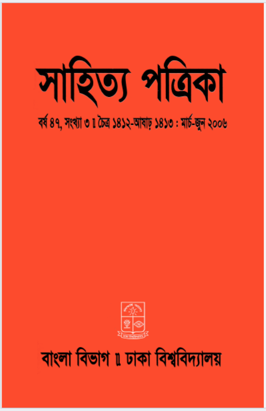

Vol. 47 | No. 3 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা : উনিশ শতকের কলকাতা ও ডিরোজিও

Volume	47
Issue	3
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Azam
Published online	June 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i3.3
Pages	৫৩-৬৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা : উনিশ শতকের কলকাতা ও ডিরোজিও

মোহাম্মদ আজম*

ব্যক্তি কখনো কখনো নিজের সৃষ্টিশীলতায় আর বৈপ্লবিক সাফল্যে ইতিহাসকে অতিক্রম করে যান বটে; কিন্তু ইতিহাসের বাস্তব পটভূমিতেই তাঁর ভূমিকা ও সিদ্ধি। ইতিহাসের গতিরেখায় ব্যক্তির অবস্থানটিকে চিনে নিয়ে তাঁর কৃতি ও কৃতিত্বের মূল্যায়ন তাই কেবল সুবিধাজনকই নয়, লাভজনকও বটে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের অন্য উপায়ও অবশ্য থাকে না। যাঁদের ক্ষেত্রে থাকে, অর্থাৎ যাঁরা অতীতকে ভবিষ্যতের দিকে শুধু টেনে নিয়ে যান না, বরং সময়ের গতিকে বদলে দিয়ে খোদ ইতিহাসের নায়ক হয়ে ওঠেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক পাঠই সবচেয়ে কার্যকর পাঠ। এই নিবন্ধে ডিরোজিও পাঠের ক্ষেত্রে আমরা তাঁকে ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করব না।

বাংলার ইতিহাসে উনিশ শতকের উপস্থিতি বেশ চোখধাঁধানো। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবনবোধের নতুনত্বে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বড় মাপের মানুষের পদচারণায় ঐ সময়ের কলকাতা ছিল মুখর। এ চোখধাঁধানো মুখরতাকে ততোধিক মহিমায় কীর্তিত করার একটা রেওয়াজ আধুনিক বাঙালি বিদ্বৎসমাজে খুবই সুলভ। বিপরীতে নানা সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে এ মহিমাকীর্তনকে সন্দেহ করার প্রবণতাও দুর্লভ নয়। (কবিরাজ ১৯৯৭) আমরা মূল্য আরোপ থেকে যথাসম্ভব বিরত থেকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বা ছেদের নিরিখে সময়প্রবাহকে দেখতে চাইব; আর এই নিরিখে বুঝতে চাইব ডিরোজিওর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও তাৎপর্য।

১

উনিশ শতকে কলকাতার বাঙালি সমাজে আমূল পরিবর্তনসূচক জাগরণ সংঘটিত হয়েছিল। এ জাগরণকে রেনেসাঁস বলা হবে কি হবে না, কিংবা মূল্য বিচারে এর ভালো-মন্দ কতটা – তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। (কবিরাজ ১৯৯৭) কিন্তু পরিবর্তনটা যে ব্যাপক ও গভীর ছিল, বড় ঘটনা ও বড় মাপের মানুষের উপস্থিতিতে কলকাতা যে ঐ শতকে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে ‘বড় ঘটনা’ বলতে বোঝাচ্ছি সে ধরনের ঘটনাকে, যার আগে-পরে সমাজ একরকম থাকেনি। ‘বড় মাপের মানুষ’ বলছি তাঁদেরকে, যাঁরা নিজ-নিজ গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশ ও দশের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন, (রায় ১৯৯২) তা সেই দেশ ও দশের সংজ্ঞার্থ নিয়ে যতই মতবিরোধ থাকুক না কেন। সামষ্টিকভাবে মনোজগতের পরিবর্তনটাও ছিল বৈপ্লবিক। (চৌধুরী ১৪০৮)

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাঙালি বিদ্বৎসমাজ এ জাগরণ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা দেখাতে শুরু করে রচিত হয় অসংখ্য ইতিবৃত্ত (কবিরাজ ১৯৯৭) স্বভাবতই এসব ইতিবৃত্তে হাজির হতে থাকেন মহামহিম ব্যক্তিবর্গ – তাঁদের কৃতি ও প্রভাব নিয়ে; আর শনাক্ত করা হয় পরিবর্তনের ধারা-প্রবণতা-পরম্পরা সব ক্ষেত্রেই ডিরোজিও হাজির থেকেছেন গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা সমেত। উদাহরণ হিসাবে বলা যাক, বিনয় ঘোষ ডিরোজিওকে দেখেছেন রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যবর্তী উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক রূপে (বিনয় ১৯৬১) অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন : 'যদি রামমোহনকে রেনেসাঁসের আদিপুরুষ না বলে রেফরমেশনের আদিপুরুষ বলি, তবে রেনেসাঁসের আদিপুরুষ বলতে হয় ডিরোজিওকে' (রায় ১৯৯৯) যাঁরা তাঁর এতটা গুরুত্ব ইতিহাসসম্মত নয় মনে করেন, তাঁরাও তাঁর জন্য ব্যয় করেছেন অনেক পৃষ্ঠা – তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি

২

উনিশ শতকের মুখ্য কুশীলবদের সাথে উচ্চারিত হলেও রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের তুলনায় ডিরোজিওর কৃতিত্বের ধরনটা কিন্তু ভিন্ন অকালপ্রয়াত এই চিরযুবা তাঁর ব্যক্তিগত অর্জনের ঝুলিটি অন্যদের মতো করে ভরিয়ে তোলার সময় পাননি; কিন্তু সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই অন্য অনেক ব্যক্তির 'ব্যক্তিত্বে'র উৎস হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। অন্তত পনেরজন (গুহ ১৯৮৮ : ১৭) কৃতি ব্যক্তি 'ডিরোজিয়ান' নামে পরিচয় দিয়ে বা পরিচিত হয়ে ডিরোজিওকে ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট সীমায় অমর করে রেখেছে। ডিরোজিওর মূল্যায়ন তাই আদতে ডিরোজিয়ানদেরই পর্যালোচনা।

'ইয়ংবেঙ্গল' নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত ডিরোজিয়ানরা গুরুর মৃত্যুর সাল পেরোতে না পেরোতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন দল হিসাবে তাঁদের পারস্পরিক বন্ধন অটুট ছিল প্রায় মৃত্যুতক আর গুরুর স্মৃতি ও শিক্ষার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই তাঁরা প্রায় সবাই কর্মমুখর জীবন যাপন করেছিলেন। (সরকার ১৯৮১ : ২১) ১৮৩১ সালেই Enquerer ও 'জ্ঞানান্বেষণ' নামের যথাক্রমে ইংরেজি ও বাংলা সাময়িকপত্রে তাঁদের প্রকাশিত হতে দেখি। আরো পরে তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামের প্রভাবশালী পত্রিকা। অন্তত পাঁচটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা। এগুলোর পাতায় ডিরোজিয়ানদের কর্মমুখরতা ও চিন্তাশীলতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত আছে।

ডিরোজিয়ানদের চিন্তা ও তৎপরতাকে এভাবে সূত্রবদ্ধ করা যায় : ক) মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নিরিখে – এককথায় ইউরোপীয় বুর্জোয়া লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা নিজেদের গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ফলে হিন্দু-ভারতের পুরানা ধ্যান-ধারণা, ধর্ম, কুসংস্কার, মূল্যবোধ ইত্যাদি তাঁদের চোখে পরিত্যাজ্য মনে হয়েছে। তাঁরা সতীদাহ-নিরোধ আইনের প্রবর্তনে উল্লাস প্রকাশ করেছেন, বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ রোধ আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন ব্যক্ত করেছেন, কথায় ও কাজে লড়েছেন নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। (কবিরাজ ১৯৯৭, শাস্ত্রী ১৯৫৭, সরকার ১৯৮১)

খ) ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষীয়দের চাকুরি ও বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য তাঁরা আন্দোলন করেছেন। অ্যাডাম স্মিথ, মিল ও বেন্থামের চিন্তায় প্রভাবিত এসব তরুণ মুক্তবাণিজ্যের পক্ষে কলম চালিয়েছেন অনেকবার; ভারতীয়দের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা বা বিনিয়োগের আইনগত সুযোগ তৈরির জন্য ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও তাঁদের কর্মযজ্ঞের অংশ ছিল। (কবিরাজ ১৯৯৭, শাস্ত্রী ১৯৫৭, সরকার ১৯৮১)

কৃষকদের ব্যাপারে তাঁদের লিপ্ততা মনে রাখার মতো। বিশেষত আইনের কড়াকড়িতে রায়তের কোণঠাসা অবস্থা কিংবা নানা উছিলায় বেশি খাজনা আদায়ের মতো প্রসঙ্গ তাঁদের বক্তৃতা-প্রবন্ধ-আলোচনায় বারবার উঠে এসেছে। তাঁরা কিছু কৃষি-সংস্কারও দাবি করেছিলেন। 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'র পক্ষ থেকে কৃষকের অবস্থা সম্পর্কে এক বিশদ রিপোর্ট তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়। এ রিপোর্ট রচনার প্রস্তুতি হিসাবে পত্রিকার পাতায় একগুচ্ছ প্রশ্ন ছেপে বের করা হয়। (কবিরাজ ১৯৯৭)

গ) 'নব্যবঙ্গের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ' বলে ডিরোজিয়ানদের বর্ণনা করেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। বাস্তবিক অনেক বছর ধরে তাঁরা নেতৃত্বের ভূমিকাই পালন করেছিলেন। একদিকে সরকারের পদস্থ আমলা হিসাবে তাঁদের কেউ কেউ সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন; অন্যদিকে ভারত-ব্রিটেন সম্পর্ক-উন্নয়নের নিমিত্তে কার্যকর সব সভাসমিতি গঠন করে তাঁরা ব্রিটিশ-ভারতীয় রাজনীতির গোড়াপত্তন করেছিলেন। ১৮৪৩ সালের ২০ এপ্রিল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫১ সালে হয় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন'। দুটোতেই ইয়ং বেঙ্গলরা সক্রিয় ভূমিকা রাখে। (সরকার ১৯৮১)

শিবনাথ শাস্ত্রী লক্ষ করেছেন, ১৮৩৪ সাল থেকে শহরের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব আয়োজনেই এ তরুণকুল হাত দিতে শুরু করেছিলেন। তিনি এ ধরনের কাজের একটা লম্বা ফর্দ দিয়েছেন। তাতে সমাজসংস্কার আন্দোলন, মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন, শিক্ষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিচিত্র উদ্যোগ-আয়োজনের উল্লেখ দেখা যায়। (শাস্ত্রী ১৯৫৭)

ডিরোজিয়ানদের কৃতিত্ব তাঁদের ব্যক্তিগত তো বটেই; একই সাথে তা ডিরোজিওরও কৃতিত্ব। তার কারণ, আগেই বলেছি, এঁরা যে আদৌ একটা কেজো ঐক্য বা সমঝোতায় থাকতে পেরেছিলেন, তা ডিরোজিওর জন্যই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মূল কারণ এ নয়। মূল কারণ : প্রথমত, যে শিক্ষা-চৈতন্য-মূল্যবোধ-প্রেরণা তাঁদের পরিচালিত করেছিল তার সর্বজনস্বীকৃত উৎস ডিরোজিও; দ্বিতীয়ত, ডিরোজিওর জীবদ্দশায় তাঁর তত্ত্বাবধানেই এঁরা এ ধারার কাজ সাফল্যের সাথে শুরু করেছিলেন।

৩

অকালমৃত্যু হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (১৮০৯–৩১) ব্যক্তিগত কৃতিত্বে বাধ সাধলেও তাঁর কর্মবহুলতা এবং বহুমুখী প্রতিভায় আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। ছাত্র

হিসেবে তিনি ছিলেন বহুপ্রশংসিত-পদকপ্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থী। অভিনয়, আবৃত্তি, বক্তৃতার মতো সহশিক্ষা কার্যক্রমেও প্রতিভার ছাপ রেখেছেন অল্প বয়সেই। (আহমদ ১৯৯৫ : ৯৪) কবি হিসাবে তাঁর কিছু খ্যাতি হয়েছিল। অল্প বয়সেই তাঁর বহু প্রবন্ধ সমকালীন সুধীজনের দৃষ্টি কেড়েছে। বলা যায়, কবি ও প্রাবন্ধিক হিসাবে এবং একজন কৃতবিদ্য তরুণ হিসাবেই ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। (শাস্ত্রী ১৯৫৭ : ৮৫) এরপর শুরু তাঁর জীবনের মূল পর্ব। বক্তা, লেখক, কবি, কর্মী ও চিন্তানায়ক ডিরোজিওকে পাশে রেখে এসময় বড় হয়ে ওঠেন শিক্ষক ডিরোজিও। শিবনাথ শাস্ত্রী যে ভাষায় এ শিক্ষকের মহিমাকীর্তন করেছেন, প্যারীচাঁদ মিত্র ও অন্য অনেকে যেভাবে এই শিক্ষককে চিহ্নিত-চিত্রিত করেছেন, তার উদ্ধৃতি না দিয়েও এ কথা জোরের সাথে বলা যায় – ডিরোজিও আরো বহুদিন নিখিল শিক্ষকসমাজের ঈর্ষাভাজন থাকবেন।

অবশ্য তিনি তো কেবল হিন্দু কলেজের ছিলেন না – ছিলেন আরো বহু তরুণের শিক্ষক। একদিকে তিনি নিজের প্রস্তুতি-গভীরতা-বিস্তার বুঝিয়ে দেন কান্টের ব্যক্তিত্বখচিত সমালোচনা করে; অন্যদিকে গণবক্তৃতার বিষয় হিসাবে দর্শন, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে চিনিয়ে দেন নিজের ধরন। বলা চলে ডিরোজিও ছিলেন যুগের শিক্ষক। কিন্তু ব্যাপারটি বুঝে ওঠার জন্য পরিচয় নেয়া দরকার সেই যুগের।

৪

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে ইংরেজ শাসনের বয়স অন্তত ছয় দশক অতিক্রম করেছে। বলা যায়, শাসক হিসাবে ইংরেজরা তখন অতিক্রম করছে দ্বিতীয় ধাপ; যখন কেবল শুল্ক আদায়ের সিধা-সরল উপায়টি আর কাজ করছিল না, বরং 'রাজ্যশাসনে'র আরো দশ নীতিনিয়মে তাদের প্রবেশ করতে হচ্ছিল। কলকাতায় তদ্দিনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাওয়া জমিদারকুল ইংরেজ শাসনের সহযোগী হিসেবে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে; অন্যদিকে বেনিয়া-মুৎসুদ্দি শ্রেণীর একটা বড় দল যথেষ্ট সম্পদ সঞ্চয় করে প্রভাব-প্রতিপত্তি হাসিল করেছে। বিত্তযোগের সাথে সাথেই দরকার পড়েছে সাংস্কৃতিক আভিজাত্যের। কেবল শাসকের ভাষা-শিক্ষা-সংস্কৃতিতেই সেই আভিজাত্য অর্জিত হতে পারত। কলকাতার উচ্চশ্রেণীটি যে ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, নিশ্চিতভাবে এটাই তার কারণ। মনে রাখা দরকার, হিন্দু কলেজের উদ্যোগ ধনী ও সম্ভ্রান্ত বাঙালিরাই নিয়েছেন। এরা গোঁড়া হিন্দু সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। (ঘোষ ২০০০)

শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক বেশি ছিল। তাদের দরকার ছিল অর্থের। আর অর্থের সাথে প্রথম থেকেই ইংরেজির যোগ অতি প্রত্যক্ষ। 'সামান্য ইংরেজি শিখলে বেনিয়ানি করা যায়, সাহেবদের হৌসে চাকরি পাওয়া যায়। তাই 'নতুন যুগে যে-বিদ্যার গৌরব ও মর্যাদা বাড়তে লাগল সমাজে, সে হল ইংরেজিবিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিদ্যা।' (ঘোষ ২০০০ : ২০)

এ বাস্তবতা ইংরেজি শেখার প্রতি কী গভীর আগ্রহ তৈরি করেছিল, তার পরিচয় পাই শিবনাথ শাস্ত্রীর বর্ণনায়। তাঁর ভাষায় : ইংরাজী শিক্ষা চাই, ইংরাজী শিক্ষা চাই এই রব দেশের সর্বত্র ধ্বনিত হইতেছিল। এমনকি 'ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ এসময় শিক্ষাকমিটীর নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণ করিল' অন্যত্র লিখেছেন : ডেভিড হেয়ার তাঁর স্কুলে ভর্তিপ্রার্থীদের অনুরোধে উপরোধে উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বাটির 'বাহির হইলেই দলে দলে বালক – me poor boy. have pity on me, me take in your school বলিয়া তাঁহার পাল্কীর দুই ধারে ছুটিত' (শাস্ত্রী ১৯৫৭ : ৪৬) ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুতে কলকাতায় যে মাতম উঠেছিল, (শাস্ত্রী ১৯৫৭ : ১৫১) তা নিঃসন্দেহে শহরবাসীর ইংরেজিশিক্ষাজনিত কৃতজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ।

ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের বাস্তবতা বোঝার জন্য কলকাতার ইউরোপীয় ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজটির কথাও মনে রাখতে হবে। এর সাথে যুক্ত হবে মিশনারিদের উদ্যোগ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য মিশনারিরাই ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করে। (শাস্ত্রী ১৯৫৭ : ৭২) তবে প্রথম ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয় ফিরিঙ্গিদের স্কুলে। (ঘোষ ২০০০ : ২০) তার চেয়ে বড় কথা, কলকাতায় তদ্দিনে ইউরোপীয় আর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজটি শুধু আকারে-প্রকারেই বড় হয়নি, নানা কারণে দেশীয় উচ্চশ্রেণীর সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েছিল। পশ্চিমা শিক্ষা প্রচলনে তাদের ভূমিকা এই সংযুক্তির বাস্তবতাই মনে করিয়ে দেয়।

শিক্ষার প্রথম ধাপ ছিল শব্দার্থ শিখে মনিবদের সাথে যোগাযোগ করতে পারা শাস্ত্রী মশায় তাঁর বিখ্যাত বর্ণনায় বলেছেন, তখন কেউ কেউ নামতা ঘোষানোর মতো করে ইংরেজি শব্দের অর্থ শেখাত। কিন্তু ক্রমশ পশ্চিমা বিদ্যা শেখানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। হিন্দু কলেজ ছিল সেই বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র। উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে ছিল সাহিত্য, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, ভূতবিদ্যা ও ভূগোল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নানা আকর গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য ছিল। (আহমদ ১৯৯৫ : ১৯) বহু খ্যাতিমান বিদগ্ধ অধ্যাপক হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। পুরা ব্যাপারটাই কলোনিয়াল রাষ্ট্রে উদ্ভূত বাস্তবতার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে হয়েছে – রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা আর নীতিনির্ধারকদের পরামর্শ মোতাবেকেই হয়েছে। ভারতীয়দের কল্যাণের কথা ভেবে এসবের পরিকল্পনা হয়নি (গুহ ১৯৮৮ : ৯) কিন্তু কোনো পরিকল্পনার ফলই সে পরিকল্পনার মধ্যে আটকে থাকে না। ইংরেজ শাসকদের শিক্ষা-পরিকল্পনার সুফল তারা পুরোপুরিই ভোগ করেছে। কিন্তু তাদের পরিকল্পনার বাইরে শিক্ষিত সমাজে অনেক উপাদানই সঞ্চিত হয়েছে, যা তাদের জন্য সুখকর ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনকাল জুড়ে আমরা বহুক্ষেত্রে এ বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছি।

ডিরোজিওর আবির্ভাব-মুহূর্তে কলকাতার যুগ-পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা এখানে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের খোঁজ নিয়েছি। আসলে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন ও প্রসারই ছিল মূল ব্যাপার বাকিগুলোর বেশির ভাগই এর ফল বা অনুগামী মাত্র। সংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তি ও ঘটনা সেকালকে রূপায়িত করেছে। উদাহরণ হিসেবে রামমোহন রায়ের কথা বলা যায় প্রকৃতিতে একেবারেই মিলহীন হলেও রামমোহন অনেক

ক্ষেত্রেই ডিরোজিয়ানদের পূর্বসূরি তাঁদের সংস্কার-প্রস্তাবের অনেকগুলোই রায়ের চিন্তা ও কর্মে উপস্থিত ছিল সতীদাহ লোপ আন্দোলন তো কলকাতার হিন্দুসমাজে সংঘটিত সকল সংস্কার আন্দোলনের প্রেরণাস্থল : সংস্কৃত ও আরবির বিপরীতে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে রামমোহনের যে অটল অবস্থান, তার ধারাবাহিকতাই পাওয়া যায় ডিরোজিয়ানদের মধ্যে (সরকার ১৯৮১) আবার ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ ও ঐ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা, পশ্চিমা কেতা অনুসরণ আর শিল্পবাণিজ্য-উদ্যোগের ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর তিনিও ইয়ংবেঙ্গলদের পূর্ববর্তী ফলে দেখা যাচ্ছে, a generation without fathers and children বলে ইয়ংবেঙ্গলদের পরিচয় দেয়ার যে রেওয়াজ, (সরকার ১৯৮১ : ২১) তা মোটেই যথার্থ নয়

ডিরোজিয়ানদের চিন্তাচেতনা ও কর্মকাণ্ডের একটা সামাজিক ভিত্তি যে কলকাতায় আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিল, তার এক নজির 'বঙ্গদূত' পত্রিকা কয়েকজন ইংরেজ ও ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রচেষ্টায় 'বেঙ্গল হেরাল্ডে'র সহচর 'বঙ্গদূত' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২৯ সালের ১০ মে। এই পত্রিকায় 'গৌড়ে' মধ্যবিত্তের উত্থান বিষয়ে সচেতনতার প্রমাণ মেলে। অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থনে এবং কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ইংল্যান্ডের উন্নত শাসনপ্রণালি সম্পর্কে জানার-বোঝার আগ্রহও এতে প্রতিফলিত হয়েছে। (কবিরাজ ১৯৯৭ : ১৫-২০) নিশ্চয়ই পুরো ভারতবর্ষ কিংবা বাঙালি জনগোষ্ঠী এ চেতনার বাহক ছিল না; কিন্তু কলকাতার নিয়ন্ত্রক অংশটি একটা 'নবযুগে' পদার্পণ করেছিল। শাসকপক্ষ, ইংরেজ ও অ্যাংলোসমাজ এবং বাঙালি মধ্যবিত্ত একযোগে সেই নবযুগকে রূপায়িত করছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর বহুল-উদ্ধৃত শনাক্তিতে শাসক-শাসিতের মেলবন্ধনেরই পরিচয় মেলে: তাঁর মতে : 'ইংরাজ পক্ষে মেকলে ও বেন্টিঙ্ক এই নবযুগের সারথি হয়েছিলেন; দেশীয় পক্ষে রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও এই পুরুষত্রয় সারথ্যকার্যের ভার লইয়াছিলেন' (শাস্ত্রী ১৯৫৭ : ৯৫)

৫

প্রশ্ন হল, ডিরোজিওই কেন নতুন যুগের নয়া ভাব-স্বভাবের কেন্দ্র হয়ে উঠলেন। ঐ বিশেষ মুহূর্তে সামাজিক জরুরত ও আকাঙ্ক্ষা যখন যথেষ্ট জোরালো আর ক্রমপ্রসারমাণ ছিল, তখন ডিরোজিওর প্রভাবের বিশিষ্টতাই বা কোথায়? এসব প্রশ্নের জবাব সমকালীন বাস্তবতার মধ্যেই খুঁজতে হবে। ব্যক্তির প্রতিভায় কিংবা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নানা অর্জনে ব্যাখ্যা-অযোগ্য অ-লৌকিকতা থাকলেও থাকতে পারে; কিন্তু লৌকিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই কেবল কাজে আসে।

সেদিক থেকে দেখলে, ডিরোজিওর ব্যক্তিস্বভাব ও প্রতিভার ধরন, তাঁর সামাজিক প্রতিবেশ এবং কলকাতার তরুণ সমাজের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে ডিরোজিও-সাফল্যের কারণগুলো বুঝতে হবে

ডিরোজিও নিশ্চয়ই ভালো শিক্ষক ছিলেন অর্থাৎ, ভালো শিক্ষকের কৌশলগত গুণাবলি তাঁর আয়ত্তে ছিল উত্তম বক্তা ছিলেন তিনি – এ গুণটিও যুক্ত হয়েছে তাঁর শিক্ষক-সত্তায় আর তাঁর শিক্ষাপ্রণালির মধ্যে যুক্তিশীলতার যে অবারিত অনুমোদন ছিল, শিক্ষার্থীকে পাঠে যুক্ত করে নেয়ার ক্ষেত্রে যে সাফল্য ছিল, তার পরিচয় তো আমরা বহু বর্ণনায় পেয়েছি। বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক গন্ডির মধ্যে একজন শিক্ষক যতটা ক্যারিশমেটিক হতে পারেন, ডিরোজিও তার সবটুকুই আত্মসাৎ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষকসত্তার মূল পরিচয় তো ক্লাসের ভেতরে নয় – বাইরে আমরা জেনেছি, ডিরোজিও ক্লাসের বাইরে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন এ তথ্য প্রমাণ করে তাঁর বলবার বা শেখাবার কথা ছিল। আমরা আরো জেনেছি, এসব বক্তৃতায় বহু ছাত্র-যুবা উপস্থিত থাকত – হিন্দু কলেজের তো বটেই, অন্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের তরুণরাও এ থেকে বোঝা যায়, শেখার একটা সামাজিক আগ্রহও তৈরি ছিল শেখানোর ও শেখার যুগপৎ আগ্রহে তৈরি হয়েছিল সামাজিক পটভূমি

শেখানোর বিষয় কী ছিল, বা শেখার? নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাঁদের চর্চার অঙ্গীভূত হয়েছিল। সব অর্থেই তখন এ বিদ্যার বাজার ছিল, আভিজাত্য ছিল। (গুহ ১৯৮৮ : ২২) এ ক্ষেত্রে ডিরোজিও সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যে, বিদ্যার যে ধরনটা বা যে শাখাগুলো প্রভাবশালী ছিল, তার সবটাতেই তিনি উচ্চাঙ্গের ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। (আহমদ ১৯৯৫ : ২২০-২১)

এরকম ব্যুৎপন্ন লোক কলকাতায় আরো ছিল। তাঁদের সঙ্গে ডিরোজিওর মূল পার্থক্য ছিল সম্ভবত এই যে, ডিরোজিও বয়সে তরুণ। তারুণ্যের আবেগ ও কর্মক্ষমতার সাথে বিষয়গত ব্যুৎপত্তিই সম্ভবত তাঁকে যুগ-শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর চর্চার ধরনটাও ছিল অগ্রসর। অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন গঠন করে বিশেষ কেতায় চিন্তা ও বিদ্যাচর্চার ঢংটি ইউরোপের অগ্রসর চর্চার ঢং থেকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন এর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের সাথে একটা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হতে পেরেছিল। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের স্থলে তৈরি হয়েছিল গুরু-শিষ্য সম্পর্ক।

পড়াশোনার বিস্তৃতি-গভীরতার বাইরে আরো অনেক গুণ ছিল ডিরোজিওর। আগেই বলেছি, কবি-প্রাবন্ধিক হিসাবে খ্যাত হয়েই হিন্দু কলেজে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ছিলেন সৎ, দৃঢ়চেতা, কর্মঠ আর নিজ বিশ্বাসে-সিদ্ধান্তে অটল সততা ও নৈতিকতার প্রচারক ছিলেন তিনি নিজেও ছিলেন এর বাস্তব মূর্তি। পদত্যাগপত্রে এবং উইলসন সাহেবকে লেখা লম্বা চিঠিতে তাঁর যে ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে, তা রীতিমত সমীহ-জাগানো। (আহমদ ১৯৯৫ : ৪৭-৪৯) ডিরোজিয়ানরা নিশ্চয়ই তাঁর মধ্যে তাঁদের কল্পনার ইংরেজ মনীষা ও মনীষীকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল।

ডিরোজিও পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত ফিরিঙ্গি। (শাস্ত্রী ১৯৫৭ : ৮৩) ঐতিহাসিকরা তথ্যটিকে একেবারেই আমলে আনেননি। কিন্তু, আমাদের ধারণা, তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ

'ফিরিঙ্গি' পরিচয় তো বটেই, এমনকি 'পর্তুগিজ' পরিচয়ও যেমন, ফিরিঙ্গি বলেই সম্ভবত ডিরোজিও ডেবিড ড্রুমন্ডের স্কুলে পড়েছিলেন কবিত্ব, সাহিত্য ও দর্শনে পাণ্ডিত্য, স্বাধীনতার চৈতন্য, নাস্তিক্য – ইত্যাদি যে সব গুণে শিবনাথ শাস্ত্রী ড্রুমন্ডকে ব্যাখ্যা করেছেন, (শাস্ত্রী ১৯৫৭ : ৮৪) তাতে পরিষ্কার বোঝা যায়, ডিরোজিওর সার্বিক ব্যক্তিত্বে ড্রুমন্ডের প্রভাব অনপনেয়। কলকাতার ইউরোপীয় সমাজে ড্রুমন্ডের মতো আরো অনেকেই ছিলেন, যাঁরা পশ্চিমা বুর্জোয়া চৈতন্য এবং জ্ঞানচর্চার যথার্থ উত্তরাধিকার বহন করতেন। কলকাতার 'আধুনিকায়নে'র প্রথম যামানায় এই ইউরো-সমাজটির ব্যাপক-গভীর প্রভাব আমরা খতিয়ে দেখিনি। রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংরেজ-সাহচর্যও কেবল তথ্য হিসাবে থেকে গেছে। অথচ একেবারেই বাস্তবসম্মত কারণে ও প্রয়োজনে কলকাতার অ্যাংলো-সমাজ ইউরোপীয় বিদ্যা আর প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা করেছে। এঁদের অনেকে ইউরোপের সাপেক্ষেও ভালো পণ্ডিত ছিলেন তাঁদের সাহচর্য বাঙালি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যে জ্ঞান ও সংস্কৃতিগত অনুকরণের প্রেরণা যুগিয়েছে। ফিরিঙ্গি হিসাবে ডিরোজিওর পক্ষে অনেক সহজেই সেই রুচি, নৈতিকতা, জ্ঞান আর মহিমা অর্জন সম্ভব হয়েছে, যা বাঙালি তরুণদের কাছে ছিল পরম আকাঙ্ক্ষার ধন।

ইউরোপীয় শাসকশ্রেণী আর অ-শাসক সমাজের স্বার্থের দ্বন্দ্বও স্মরণীয় দ্বন্দ্ব ছিল নিশ্চয়ই ইংরেজ ও অ-ইংরেজ স্বার্থেও। ভাবা অবাস্তব নয় যে, জাতে পর্তুগিজ হওয়াটা ডিরোজিওর ইংরেজশাসননীতির বহুমাত্রিক সমালোচনা, নেটিভদের প্রতি পক্ষপাত এবং কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য-বিরোধিতায় গভীর প্রণোদনা যুগিয়েছে। এডওয়ার্ডকৃত ডিরোজিওর প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থে তাঁকে মূলত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নেতা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। (সরকার ২০০০ : ৩১)

উনিশ শতকের কলকাতার ইতিহাসে ডিরোজিয়ানদের প্রধান যে অবদান, তার পেছনেও অ্যাংলো সমাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের প্রধান অবদানটা কী? সুশোভন সরকার লিখেছেন : contemporary society was shocked beyond measure by the doings of Derozians। (সরকার ১৯৮১ : ২০) শাস্ত্রী লিখেছেন : 'এরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, হিন্দু কলেজের সমুদয় ভালো ভালো ছাত্র খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করিবে'। (শাস্ত্রী ১৯৫৭ : ১০৭) স্মরণ করা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বিখ্যাত মন্তব্য : মদ্য, মুরগী ও টেকচাঁদী বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য গোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। সমাজের মধ্যে এই যে আলোড়ন, ঝাঁকুনি, সমাজকে সহসা সচকিত করে তোলা – বলা যায়, এটাই ডিরোজিয়ানদের প্রধান অবদান। সমাজের একটা রূপান্তর তো আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণেই ঘটছিল। কিন্তু এ ধীরলয়ের রূপান্তর সামাজিক সংস্কার আর নানা পুরানা বন্ধনকে কাবু করতে পারছিল না। 'রাগী ও জেদি' ডিরোজিয়ানদের প্রচণ্ডতায় অনেক বাঁধনই আলগা হয়ে গেল। অসম্ভব নয় যে, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেই রামমোহন রায়ের নির্জীব ব্রাহ্মসমাজ এক যুগ পরে শক্ত সামাজিক ভিতে দাঁড়াতে পেরেছিল।

এক্ষেত্রে কলকাতার অ্যাংলো সমাজের গুরুত্ব এই যে, তাদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক থাকায় তরুণ বাঙালি সমাজের পক্ষে ইউরোপীয় রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও নৈতিকতা সম্পর্কে একটা বাস্তব ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছিল শিবনাথ শাস্ত্রী জানাচ্ছেন : 'ডিরোজিওর ভবনে হিন্দু কালেজের অগ্রসর বালকদিগের হিন্দুসমাজ-নিষিদ্ধ পান-ভোজনের অভ্যাস হইয়াছিল (শাস্ত্রী ১৯৫৭ : ৮৬) অন্য ইউরোপীয় ভবনেও বালকদের দাওয়াত হত তারা সেখানে সুরাপানে অভ্যস্ত হত (শাস্ত্রী ১৯৫৭ : ৮৬) ডিরোজিওর পরিবারের সদস্যদের সাথেও এ তরুণদের সম্পর্ক ছিল গভীর। 'উৎকৃষ্ট' সমাজের পরিচয় এর মধ্য দিয়ে তাঁদের মনে নিশ্চয়ই গেঁথে গিয়েছিল। তাঁরা যে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কারকে পরিহার করতে চেয়েছিলেন, তার জোর তাঁরা পেয়েছেন পরিচিত ইউরো-সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে। ফলে দেখা যাচ্ছে, ফিরিঙ্গি হওয়াটা নানাভাবে ডিরোজিওর যুগ-শিক্ষক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আনুকূল্য যুগিয়েছে।

বহু আনুকূল্যের সাথে অজস্র গুণ আর কর্মোদ্যোগ মিলিয়ে যুগের প্রধান ভাবকে ধারণ করতে পারা এবং সেই ভাব ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করা ব্যক্তিত্ব সব কালেই বিরল। ডিরোজিও সেই বিরলপ্রজ পুরুষ হিসাবেই ইতিহাসে সম্মানিত হবেন।

৬

ঔপনিবেশিক ভারতের প্রেক্ষাপটে ডিরোজিও এবং ডিরোজিয়ানদের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিকে লক্ষ রাখা জরুরি। মনে রাখা দরকার : 'উপনিবেশের জীবনের কোনো কিছুকেই সাম্রাজ্য তার ক্ষমতা প্রয়োগের লক্ষ্যের পরিধির বাইরে যেতে দেয় না। (রায় ১৯৯০ : ১৫) অথচ ঐ আমলের ইতিহাস পর্যালোচনায় আমাদের অধিকাংশ পাঠই এক ধরনের tradition-modernization কিংবা conservative-progressive ধরনের সরল-সোজা বাইনারিতে আটকে থাকে। বাদ পড়ে যায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের রাজনৈতিক অর্থনীতি – তার বহুবিধ ব্যাকরণ। (সরকার ২০০০ : ২৬)

কলোনিয়াল ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনায় একটা গোড়ার গলদ হল উনিশ শতকের আগের সময়টিকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেয়া। এর ফলে আমরা ভুলে যাই : 'কলোনাইজেশনের প্রথম ধাপ মোটেই আত্মসমর্পণের ছিল না, কণ্টকমুক্ত ছিল না'। (গুহ ১৯৮৮ : ৬) শিক্ষার ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য। রণজিৎ গুহ এক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন : প্রথম ধাপে ইংরেজ প্রভুরা দাসের জ্ঞানের জন্য – বিশেষত ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য লালায়িত ছিল। ইংরেজরা পরম যত্নে সংস্কৃত-ফারসি-আরবি শিখেছিল – ভারতবর্ষের অসংখ্য ইতিহাস প্রণয়ন করেছিল। (গুহ ১৯৮৮ : ৫-৮) সেই অবস্থা পাল্টে কীভাবে ইংরেজি ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল – শুধু জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও হীনতা দিয়ে তা বোঝা যাবে না। আসলে ইংরেজি বা পশ্চিমা শিক্ষা ভালো কি মন্দ, প্রগতিশীল না প্রতিক্রিয়াশীল–এ প্রশ্নই এখানে অবান্তর। কলোনিয়াল রাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি, সে রাষ্ট্রের অধীন উচ্চশ্রেণীটির উৎপাদন-বণ্টন সম্পর্কের নিরিখেই বিচারটি করতে হবে।

সেদিক থেকে দেখলে পশ্চিমা শিক্ষা আসলে রাষ্ট্রের জন্যই দরকার ছিল, যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে কার্যকর সমঝোতা বা সম্মতি তৈরি করবে। এ সম্মতি পুরোমাত্রায় তৈরি হয়েছিল। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, তার এক কারণ তো মধ্যবিত্তের সম্মতি। ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অন্তত একশ বছর সে শাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কাজ করছিল, বিশেষত বাংলা অঞ্চলে। (সরকার ২০০০ : ২৮)

ডিরোজিয়ানদের পুরো শিক্ষাকার্যক্রম এ বাস্তবতার অধীনেই পড়তে হবে।

ডিরোজিয়ানদের কর্মে-চিন্তায় নানা স্ববিরোধ, সীমাবদ্ধতা এবং বাড়াবাড়ি চোখে পড়ে। অতিরিক্ত মদ্য আর বেশ্যাসক্তি তাঁদের কারো কারো পতনের কারণ হয়েছে। যৌবনের চাঞ্চল্য পার করে এককালের ধর্মদ্রোহী এ দলের অনেকেই নিষ্ঠাবান ধার্মিক হয়ে উঠেছিলেন। সরকারি চাকুরিতে বেশ আনুগত্যেও সঙ্গেই তাঁদেও অনেকে কাজ করেছিলেন। কোনো প্রকার দার্শনিক ভিত তৈরি না করেই অন্যের আচার ও বিশ্বাসকে তাঁরা ব্যাপকভাবে আক্রমণ করেছিলেন। এ ধরনের বহু সীমাবদ্ধতা শনাক্ত করা যায়।

এক্ষেত্রে কয়েকটি দিকে লক্ষ রাখা জরুরি। প্রথমত, ডিরোজিয়ানরা কোনো মতাদর্শিক ঐক্যে একত্রিত সংঘসদস্য ছিলেন না। ফলে তাঁদের চিন্তা ও কর্মের মূল্যায়ন চূড়ান্ত বিচারে একসাথে হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, আর্থিক অনিশ্চয়তার সাথে ইয়ংবেঙ্গলদের জঙ্গি মনোভাবের একটা সম্বন্ধ আছে। ইংরেজি শিক্ষিতদের চাকরির দ্বার অবারিত হওয়ার পেক্ষাপটে সুর চড়া থেকে ক্রমে খাদে এসে ঠেকেছে। (সরকার ২০০০) তৃতীয়ত, দীর্ঘ জীবনে নানা বাস্তব পরিস্থিতিতে তাঁদের নানারকম সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তাঁদের সামষ্টিক সক্রিয়তার কালকেই কেবল বিবেচনায় আনা উচিত। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতা সঙ্গত কারণেই নানা স্ববিরোধে আক্রান্ত ছিল। এর প্রভাব ডিরোজিয়ানদের উপরও পড়েছে। ডিরোজিয়ানদের সীমাবদ্ধতা-স্ববিরোধ ব্যাপকার্থে তাঁদের কালেরই বাস্তবতা।

আরেকটি প্রশ্ন তোলা দরকার : ডিরোজিয়ানরা কি বিদ্রোহী বা প্রথাবিরোধী? হলে, কতটা? বলা যায়, ডিরোজিয়ানরা বিদ্রোহী এবং প্রথাবিরোধী বটে, তবে খুব সীমিত অর্থে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁদের বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় বেশ পাওয়া যায়; কিন্তু ক্ষমতাকেন্দ্রের বিরুদ্ধে কিংবা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁরা টু-শব্দটিও করেননি। বরং কৃপা ও সুদৃষ্টি প্রত্যাশা করে প্রচুর আবেদন-নিবেদন করেছেন। আবার ভারতীয় প্রথার ব্যাপক বিরোধিতা করলেও ইউরোপীয় কোনো কিছুর সমালোচনা করতে তাঁদের দেখা যায়নি। এমনকি প্রবল ধর্মবিরোধিতার মধ্যেও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন বেশ নমনীয়। মুসলমান শাসন যে খুব খারাপ ছিল, সে বিষয়ে সমকালীন কলকাতার অন্যদের মতের সাথে তাঁদের কোনো বিরোধ ছিল না। (সরকার ২০০০ : ৪০) যেমন মতৈক্য ছিল ব্রিটিশ শাসন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিবাচকতা সম্পর্কে। ফলে ডিরোজিয়ানরা একটা বিশেষ অর্থেই কেবল বিদ্রোহী ও প্রথাবিরোধী; কোনো বিশ্বজনীন সংজ্ঞার্থে নন।

৭

কিন্তু কেবল ঔপনিবেশিকতার বিবেচনায় ডিরোজিও বা ডিরোজিয়ানদের আলোচনা শেষ হতে পারে না কারণ, ছেদ ও ধারাবাহিকতা মিলে নিশ্চয়ই ইতিহাসের একটা কার্যকর প্রবাহ থাকে। যেমন, আমরা, বাঙালি মধ্যবিত্ত – ঢাকার ও কলকাতার – নানাভাবে বহন করে চলেছি উনিশ-বিশ শতকের উপনিবেশ-আমলের লাভ-লোকসান। তার পর্যালোচনা চলতে পারে, কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া যায় না

আজ দু শ বছর পরে ডিরোজিওকে পাই চিরকালের এক শিক্ষক হিসেবে। যিনি প্রশ্ন তুলেছেন, তুলতে শিখিয়েছেন। যুগকে আত্মসাৎ করেছেন এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর সময়ের প্রশ্ন নিশ্চয়ই আজকের দিনের প্রশ্ন নয়। তাঁর কর্মপদ্ধতি নিশ্চয়ই হুবহু অনুসরণীয় নয়। তবে, আজকের দিনের প্রধান ভাব ও স্বভাব বুঝে উঠতে তিনি আমাদের প্রেরণা যোগান, কর্মপদ্ধতি ঠিক করে উঠতে পুরাতন অভিজ্ঞতা হিসাবে পাশে থাকেন – তাঁর কালের অর্জন-বিশিষ্টতা-সীমাবদ্ধতা সমেত।

পুস্তকতালিকা :

১. আহমদ, সফিউদ্দিন ১৯৯৫ : ডিরোজিও : জীবন ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
২. কবিরাজ, নরহরি (সম্পাদিত) ১৯৯৭ : উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক, ২য় প্রকাশ, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা
৩. গুহ, রণজিৎ ১৯৮৮ : An Indian Historiography Of India : A Nineteenth-Century agenda and its implications, Centre For Studies In Social Sciences, Calcutta
৪. ঘোষ, বিনয় ১৯৬১ : বিদ্রোহী ডিরোজিও, বাক্-সাহিত্য, কলকাতা
৫. ঘোষ, বিনয় ২০০০ : বাংলার বিদ্বৎসমাজ, ৪র্থ সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা
৬. চৌধুরী, নীরদচন্দ্র ১৪০৮ : বাঙালী জীবনে রমণী, চতুর্দশ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা
৭. রায়, দেবেশ ১৯৯০ : উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য, প্যাপিরাস, কলকাতা
৮. রায়, শিবনারায়ণ ১৯৯২ : রেনেসাঁস, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা
৯. রায়, অন্নদাশঙ্কর ১৯৯৯ : বাংলার রেনেসাঁস, ১ম বাণীশিল্প সংস্করণ, বাণীশিল্প, কলকাতা
১০. শাস্ত্রী, শিবনাথ ১৯৫৭ : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ২য় সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা
১১. সরকার, সুশোভন ১৯৮১ : Bengal Renaissance And Other Essay, second print, People's Publishing House, New delhi
১২. সরকার, সুমিত ২০০০ : A Critique Of Colonial India, 2nd edition, Papyrus, Calcutta